“মন তুমি বাঁচো— একটি বৈদিক আকুতি”

অধ্যাপক মৌ দাশগুপ্ত
অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রস্তাবনা

পৃথিবী জুড়ে অতিমারীর তাণ্ডব চলছে। এই মৃত্যু মিছিলের বোধহয় আর শেষ নেই। আমরা কার্যতঃ গৃহবন্দী থেকে এই রোগের আক্রমণকে প্রতিরোধ করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে চলেছি। রোগের সংক্রমণ এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে আমরা কেবল পরস্পরের থেকেই নয় ক্রমশঃ নিজের ‘আমি’ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি।

অবসাদ ঘিরে ধরেছে আমাদের। এই প্রবন্ধে প্রাচীন বেদচতুষ্টয় এবং তন্নিষ্ঠ বৈদিক সাহিত্য (মূলতঃ ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্) অনুসারে জীবনক্ষয়ী অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

যে মানসিক অবসন্নতা বা অবসাদকে আমরা ‘ডিপ্রেশন’ আখ্যা দিয়ে নিতান্ত আধুনিক বলে বোধ করি, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম পুরা-উপাদান, বেদেও তার স্বরপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শুধু বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনই নয়, ব্যর্থ প্রেমের মতো অবসাদের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। পূর্বরাগের দশ দশার মতোই অবসাদেরও নানা স্তর থাকে। তবে, চূড়ান্ত পর্যায়েও হেরে-যাওয়া, প্রায় হারিয়ে যাওয়া মানুষটি আবারও ফিরে আসতে পারে, যদি সে নিজের মন-কে চেনে, বন্ধুর বাড়িয়ে দেওয়া হাতটি ধরে।

বেদ জেনেছিলেন শরীর নশ্বর এবং তার নানাবিধ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু মন অনন্ত, মন বিরাট। মনই ব্রহ্ম।

তাই অবসাদের অতল থেকে উঠে আসার জন্য, পুনর্জন্মের জন্য— প্রাণ নয়, মনের কাছেই প্রার্থনা করা হয়েছে। শুধুমাত্র মনই উচ্চারণ করতে পারে সেই পরম শান্তি মন্ত্র। পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ-এর উপশমের এ ভিন্ন উপায় নেই।

"হে মাতৃতমা, নদীতমা, দেবীতমা, সরস্বতি, আমরা বড়ো অপ্রশস্ত, আমাদের প্রশস্তি (উদারতা) ঘটাও" ["অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী/অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি।।" (ঋগ্বেদ ২/৪১/১৬] — আমাদের এই অপ্রশস্ততা, অনুদারতা— এই তো সব দুঃখের কারণ। মন-কে যদি খুলে দেওয়া যায় আকাশে, হাওয়ার সঙ্গে মেলে দেওয়া যায়, পঞ্চভূতের সঙ্গে এক করে দেখা যায় (তখন) কোথায় দুঃখ, কোথায় ভয়?

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের শরীর আছে; সেই শরীরে মন আছে— এ সব নিয়েই আমাদের বাঁচতে হয়। শরীরের যেমন অসুখ হয়, মনেরও তেমন অসুখ হয়।

বেদে আমরা এই মনের কথা পাই। ঋগ্বেদে রয়েছে সৃষ্টিরও পূর্বকালের কথা। "তখন অন্ধকার ছিল গহন আঁধারে ঢাকা"। সেই গাঢ়তর তমসার থেকে সৃষ্টির জন্ম হল কীভাবে? সৃষ্টিকর্তার মনসো রেতঃ" ["কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" (ঋগ্বেদ ১০/১২৯/৪)] থেকে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার মনের সৃষ্টিবীর্য থেকে। তিনি চেয়েছিলেন, ইচ্ছে করেছিলেন যে সৃষ্টি হোক— তাই সৃষ্টি হল। এই ইচ্ছেটুকুই আমাদের মনের সম্বল। নাসদীয় সূক্তে (ঋ. ১০/১২৯) ঋগ্বেদ বলছেন, সৃষ্টকর্তার মনের ইচ্ছেই সৃষ্টির কারণ।

আমাদের নতুন কবি বলেছেন— "ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে"। আমাদের মনে সেই ইচ্ছের বীজই অঙ্কুরিত বিকশিত হয়ে ডালপালা মেলে— তাতে ফল ধরে। এই ফল কি আমি খাব, নাকি খাব না— সেও আমার ইচ্ছাধীন।

এই যে মন যা আমাদের সৃষ্টির কারণ, তার স্বরূপ কী? ঋগ্বেদের কথা আগেই বলা হয়েছে, পরে বলতে হবে আবারও; কারণ ঋগ্বেদ ১০,৫৫৫টি মন্ত্রের এক সুবৃহৎ সংকলন, যার শেষ হয়েছে সংজ্ঞান সূক্তে মনের উদ্দেশে প্রার্থনায়। যেখানে সবার মনের আকুতি হোক সমান— এই প্রার্থনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ঋগ্বেদকে এক সর্বজনীন আকুতিতে উপনীত করে কবি যেন এই নানাবিধ বিষয়ের উপসংহারের দ্বারা ঋগ্বেদের সমাপ্তিতে পৌঁছচ্ছেন। এই সূক্তে ঋষি বলছেন, এই যে আমরা কতো নানান রকমের— নানান ধরনের, কতো বিচিত্র আমরা— তবু আমাদের আকুতিটি যেন সমান হয় ("সমানী ব আকূতি")। আকূতি (= আকুতি) কাকে বলে? কী এই আকুতি? এই আকুতি শব্দটিকে রয়েছে ভ্বাদিগণীয় কুঙ্-ধাতু। কু-ধাতুর মানে হল গতি (কুঙ্ গতৌ)। এই গতি একরকমের ঠেলা দেওয়াও বটে— প্রেরণা - কবির মনে যে প্রেরণা, তাই হচ্ছে আকুতি। অর্থাৎ, আমরা যে যেমন, যত ভিন্নই হই না কেন, আমাদের মনে যে প্রেরণা জন্মায়, যা আমাদের ভালো কাজ বা মন্দ কাজে প্রবৃত্ত করে— তা আমাদের সবার যেন এক হয়। আমাদের মনের সেই প্রেরণা বা আকুতির শুভাশুভের ওপরেই নির্ভর করে আমাদের যাবতীয় দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, আমাদের জগৎ-সংসার, আমাদের নিত্যদিনের জীবন— আমাদের ব্যক্তিগত বেঁচে থাকা।

মন-এর স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেছেন— "সংকল্পবিকল্পাত্মকং মনঃ"। অর্থাৎ, মন সংকল্প-বিকল্প করে। 'আমি কোনও কাজ করব' মনে মনে এই যে স্থির করা— এটি সংকল্প; আবার 'আমি কোনও কোনও কাজ করব না' সেটা স্থির করা— এই হল বিকল্প। সংকল্পের বিপরীত শব্দ বিকল্প। তাহলে

দেখা গেল, সংকল্প করা যেমন মনের কর্ম, ধর্ম; তেমন-ই বিকল্প করাও মনের ধর্ম-কর্ম। অতএব, আমাদের সংকল্প যদি শুভ হয় আমাদের কর্মটিও শুভ হবে।

শুক্লযজুর্বেদের চৌত্রিশতম অধ্যায় শিবসংকল্প সূক্তের ছ'টি মন্ত্রের দ্বারা ঋষি অগস্ত্য স্তুতি করেছেন মনের। সেখানে ঋষি বলছেন—

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং
তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং
তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু॥১॥

যেন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো
যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ।
যদপূর্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং
তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু॥২॥

যৎ প্রজ্ঞানমুতচেতো ধৃতিশ্চ
যজ্জ্যোতিরন্তমৃতং প্রজাসু।
যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিয়তে
তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু॥৩॥

যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যত্
পরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্।
যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা
তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু॥৪॥

যস্মিন্নৃচঃ সাম যজূংষি
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ।
যস্মিঁশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং
তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু॥৫॥

সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যাত্
নেনীয়ত্যেভীষুভির্বাজিন ইব।
হৃৎ প্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং
তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু॥৬॥

জাগ্রত বা জেগে থাকা মানুষের মন যেমন অনেক দূর চলে যায়, তেমনি ঘুমিয়ে থাকা মানুষের মনও বহুদূর

চলে যেতে পারে— যেখানে আমি পৌঁছতে পারি না, আলোকরশ্মিও হয়তো পৌঁছতে পারে না সেই অতিদূরে মন চলে যায়। মন সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামীও। একথা আমাদের বেদ-উপনিষদে বারংবার বলা হয়েছে। মহাভারতেও বলা হয়েছে এমন কথা [''মনঃ শীঘ্রতরং বাতাঃ...'' (বনপর্ব, ২৯৭/৪১)]।

এই যে ''দূরংগম''— দূরগামী মন আবার ''জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ''— সব আলোর সেরা আলো। আলো তো আমাদের দেখতে সাহায্য করে। এমন যদি হয় যে, আলো রয়েছে কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তি নেই, তাহলে সে আলো তো আমার কাছে জগৎকে প্রকাশিত করতে পারবে না। অথবা, আমার শ্রবণক্ষমতা না থাকলে— পৃথিবীর কোনো শব্দ আমার কাছে পৌঁছবে না। বস্তুতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদের কাছে পারিপার্শ্বিক জগৎকে প্রকাশিত করে তথা আলোকিত করে। তাই ইন্দ্রিয়গুলিকে বৈদিকসাহিত্যে প্রায়শই উল্লেখ করা হয় ''দেব'' বা ''প্রকাশক'' বলে। এই বহির্জগৎ আমাদের কাছে ধরা দেয় না কোনোমতেই যদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সচল থেকেও আমাদের মনটি বিকল থাকে। যিনি উন্মাদরোগগ্রস্ত শীতকালে তাঁর শীতের বোধ হয় না, মন যখন বিকল তখন কোন আনন্দের অনুভূতিই আমাদের সুখী করে না; সর্বপ্রকার রূপ-রস-গন্ধ তখন বিস্বাদ লাগে। তাহলে এটা স্পষ্ট যে মনই জাগতিক বিষয়ের বোধগুলি আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় কীভাবে? প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুত্-ব্যোম এই পঞ্চভূতাত্মক বহির্জগৎ বা বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযোগ ঘটে। এই ইন্দ্রিয় আবার সংযুক্ত হয় মনে। ইন্দ্রিয়-মন-সংযোগের ফলে বিষয় সম্বন্ধে যা জানা গিয়েছিল তা পৌঁছয় বুদ্ধিতে। আর বুদ্ধি সেই জ্ঞান পৌঁছে দেয় আত্মাকে। এই ক্রমেই আমাদের জ্ঞান (Cognition) হয়। সংক্ষেপে এই হল পরম্পরাগত জ্ঞানতত্ত্ব।

ইতিপূর্বে শুক্লযজুর্বেদের শিবসংকল্প-সূক্তের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই সূক্তের ছ'টি মন্ত্রের শেষ চরণে ধ্রুবপদের মতোই উচ্চারিত হয়েছে— ''তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তুঃ''— 'আমার সেই মন শিবসঙ্কল্প যুক্ত হোক'— এই বাক্যটি। শিব অর্থাৎ শুভ। এখানে প্রার্থনা করা হয়েছে যে, আমার মন সে-ই শুভ সংকল্পে যুক্ত হোক যা-শুধু আমার জন্যেই নয়, এমনকি জগতের সকলের জন্যেও শুভ।

এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে (''যত্ প্রজ্ঞানম্ ... শিবসংকল্পমস্তু'') যা প্রজ্ঞান, যা চেতন, বা যাকে আমাদের ধৃতি বা ধারণী শক্তি বলা হয়েছে; তাদের কিছুই যে মন ভিন্ন আর কিছু নয়— এই তত্ত্বটির প্রতিপাদন করা হয়েছে। যা সব প্রাণীরই অন্তরের অমৃতজ্যোতি এবং যাকে ছাড়া কোনো কাজই করা যায় না, আমার সেই মন শিবসংকল্পে যুক্ত হোক।

এই মন ইন্দ্রিয়গুলিকে শাসন করে। মন যদি সারথি হয়, ইন্দ্রিয়গুলি তাহলে অশ্ব। অতিপ্রাচীন শুক্লযজুর্বেদের শিবসংকল্প সূক্তের ষষ্ঠ তথা শেষ মন্ত্রে (''সুষারথি ... শিবসংকল্পমস্তু'') মনকে সেই সু-সারথির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে তার রথের অশ্বগুলিকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করে রথের আরোহীকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়, আরোহীকে তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেয় না কখনও। কোথায় থাকে এই মন? ঋষি বলেছেন সে হৃত্প্রতিষ্ঠ— হৃদয়ে তার স্থিতি; সে 'অজির'— কখনও জীর্ণ হয় না এমন চিরযুবা। মন যে সর্বাধিক দ্রুতবেগসম্পন্ন ('জবিষ্ঠ')— এ কথা তো আগেও বলা হয়েছে।

এমন যে মন সে শিবসংকল্পে যুক্ত হোক। অর্থাৎ, মনের সংকল্পবিকল্পাত্মকতার মধ্যে যেন শিব-ভাব বিদ্যমান থাকে— এমনই আকুতি জানিয়েছেন ঋষি অগস্ত্য শুক্লযজুর্বেদের এই শিবসঙ্কল্পসূক্তে।

এযাবৎ, যে মনকে আমরা দেখেছি ঋগ্বেদ এবং শুক্লযজুর্বেদের আলোকে— শতপথব্রাহ্মণে (১/৪/৫/৮-১৩) তার সম্বন্ধে একটি চমৎকার কাহিনী রয়েছে— 'বাঙ্‌মনসোঃ উপাখ্যানম্' (বাক্ এবং মনের কাহিনি)। অতিপ্রসিদ্ধ এই কাহিনিটির প্রতিপাদ্য বাক্ অর্থাৎ বাণী (= শব্দ) এবং মনের বিবাদ-বিসংবাদ। বিতর্কের মূলে রয়েছে— ''উভয়ের মধ্যে কে প্রধান''— এই চিরকালীন প্রশ্ন।

বাকের বক্তব্য— আমি মন্ত্র, আমি দেবতাদের কাছে 'হবি' পৌঁছে দিই, তাই আমি বড়ো। মন বলছে— আমি তোমাকে মনন করি, ধারণ করি, তবে তুমি উচ্চারিত হয়ে শব্দ ধ্বনিত হতে পারো। অতএব, আমি বড়ো।

বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য অবশেষে তাঁরা প্রজাপতির কাছে এলেন। প্রজাপতি বললেন—''যদ্ মনসা ধ্যায়তে, তদ্ বাচা উচ্চার্যতে''। মন যা ভাবে বাক্ তাই বলে। প্রজাপতির সিদ্ধান্তে বাক্ মোটেই খুশি হলেন না। তিনি বললেন— এরপর থেকে যখনই প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হবে, তখন (মন্ত্র উচ্চারণ না করে) মনে মনে মন্ত্র বলা হবে। আজও বৈদিকে যজ্ঞে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়ার সময় সশব্দে মন্ত্রোচ্চারণ করা হয় না, সেখানে মন্ত্র পড়তে হয় মনে মনে। শতপথব্রাহ্মণের কাহিনিতে এভাবে মনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। এই একই কাহিনি আরও অনেক ব্রাহ্মণেই পাওয়া যায়, ঈষৎ ভিন্ন ভাষায়।

শুধু ব্রাহ্মণের কাহিনিতেই যে এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে তা নয়, বস্তুতই আমরা বক্তব্য-বিষয়টি আগে মনে ভেবে নিয়ে তারপর কথায় তাকে প্রকাশ করি। না-ভেবে কথা বলার পরিণাম তো সকলেরই জানা আছে। সুচিন্তিত প্রিয় কথা আমাদের যেমন আনন্দ দেয়, আবার সেই কথাই অবিবেচনাপ্রসূত হলে আমাদের মর্মান্তিক আঘাত করে। তাহলে দেখা গেল, আমাদের মানসিক অবসাদের অন্যতম প্রধান কারণ কথা বা বাণী, মনের ভাব-প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। যদি এই কথা অবিবেচনাবশত নিষ্ঠুরভাবে প্রয়োগ করা হয় তা তীক্ষ্ণ শল্যের মতোই শ্রোতার হৃদয় বিদীর্ণ করে দেয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেছেন সব ক্ষতের উপশম হয় কিন্তু (নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা কৃত) বাক্-ক্ষত কখনও সারে না— ''বাক্-ক্ষতং ন রোহতি''।

আচার্য অন্নংভট্টের ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থ তর্কসংগ্রহে মনের লক্ষণ (definition) এভাবে বলা হয়েছে— ''সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং মনঃ''। সুখ প্রভৃতির উপলব্ধির সাধন বা ইন্দ্রিয় হল মন। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন স্পষ্টতই মনকে ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করেছে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক দিয়ে আমরা যেমন বহির্জগতের রূপ দেখি, শব্দ শুনি, ঘ্রাণ পাই, খাদ্যসামগ্রীর রস-আস্বাদন করি, উষ্ণ ও শীতলের পার্থক্য বুঝি; তেমনই মন দিয়ে আমরা সুখ ও দুঃখ অনুভব করি। এই মন আমাদের ষষ্ঠেন্দ্রিয়— তাকে ছাড়া বাকি পাঁচটি (ইন্দ্রিয়) কোনো কাজ করতে পারে না।

আমরা জানি, কারুর যদি মন বিকল হয়, তবে সে কোনও অপরাধের "eyewitness" তথা প্রত্যক্ষদর্শী হলেও আদালতে তার সাক্ষ্য গৃহীত হয় না। অর্থাৎ, আমরা চোখে যা দেখছি তা যাচাই করার দায়িত্ব মনের। তাই শারীরিক কুশলতার মতোই মনের সুস্থতাও আমাদের চিরকাম্য।

ইন্দ্রিয়সমূহকে দার্শনিক পরিভাষায় করণও বলা হয়। আমাদের শরীরের অন্তঃস্থিত হওয়ায় মন আমাদের অন্তঃকরণ। বাইরের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মতো মন দৃষ্টিগোচর নয়। তার আকার-প্রকার সম্বন্ধে তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট বলেছেন—"তচ্চ প্রত্যাত্মনিয়তত্বাদনন্তং পরমাণুরূপং নিত্যং চ"। প্রতিটি আত্মায় মন নিয়ত রয়েছে। আত্মা মূলতঃ এক হলেও প্রতি জীবের ক্ষেত্রে জীবাত্মা রূপে অনেক। আমরা একেই 'আমি' বলি।

আমাদের এই আমি-র সঙ্গে মনের কী সম্পর্ক?

পরমাত্মা অনন্ত। আমাদের এই আমি বা জীবাত্মা তো পরমাত্মার অংশ। অতএব, জীবাত্মা অনন্ত। আর প্রতিটি জীবাত্মায় মন রয়েছে। সেই কারণে মনও অনন্ত।

এই অনন্ত মন কিন্তু আকারে পরমাণু। তাই মনকে কখনও চোখে দেখা দেখা যায় না।

আবার, মন নিত্য। শরীরের কিন্তু এই নিত্যত্ব নেই। জরায় বিকল হয়ে, জীর্ণ হয়ে একসময়ে আমাদের শরীর বিনষ্ট হয়। কিন্তু শরীর ধ্বংস হলেই কি মনের বিনাশ ঘটে?

আমাদের উপনিষদকারেরা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ শারীরক ব্রাহ্মণে (৪/৪) শরীর থেকে জীবাত্মার উত্ক্রমণের (নিষ্ক্রমণের) কথা বর্ণনা করা হয়েছে। (মৃত্যুকালে) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ), পঞ্চভূত (ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম) এবং মন ও বুদ্ধি— এই সকলের সারভূত অংশ নিয়ে গঠিত সপ্তদশাবয়বাত্মক সূক্ষ্মশরীর, উপনিষদ্ যাকে লিঙ্গশরীর বলেন; এই জীবদেহকে ত্যাগ করে যান। তখন প্রাণহীন শরীর নিঃস্পন্দ পড়ে থাকে— (এই সপ্তদশাবয়বের অভাবহেতু) আমরা তাকে অশুচি জ্ঞান করি।

জীবদেহ থেকে নির্গত হয়ে এই সূক্ষ্মশরীরের সপ্তদশ অবয়ব পরমাত্মায় মিলিত হয়। এরপর তার কৃতকর্মের ফল অনুসারে তার পরবর্তী জন্মের সুখ-দুঃখের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। জন্ম এবং জন্মান্তরের আবর্তে বদ্ধ মানুষ জন্ম-জন্মে তার দশ-ইন্দ্রিয় এবং মন-সহ এই সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু চিরসুখের অভিলাষী মানুষ কখনওই দুঃখ পেতে চায় না; তাই সে জন্মান্তরের শৃঙ্খল থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে চায়।

এই মুমুক্ষু বা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিকামীরা সাধারণ সংসারী মানুষ নন। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ, যাদের মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা নেই— পৃথিবী-জোড়া অতিমারীর কবলে সেই আমরা আজ গৃহবন্দী হয়ে আছি। আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের স্বাভাবিক যাপিত জীবন। ফলতঃ ক্রমশঃ মানসিক অবসাদ আমাদের ঘিরে ধরছে। মন-কে যদি তার স্বরূপে চিনতে না পারি, তাহলে এই অবসাদ আমাদের গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু যদি আমরা বুঝতে পারি আমাদের মন কতো শক্তিশালী, তবে এই অবসাদ আমরা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে পারবো।

ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে অবসাদের ভিন্ন ভিন্ন কারণ থাকতে পারে। বর্তমানে কার্যতঃ গৃহবন্দী হয়ে থাকার ফলে, আমরা প্রত্যক্ষতঃ বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। দৈনন্দিনের অভ্যাসে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া

ঘটছে না। যেতে পারছি না ভালো-লাগা রাস্তার মোড়ে বা নদীর ধারে। উদ্বেগের উপশম ঘটবে যেখানে তেমন কোনও সর্বজনমান্য উপাসনাগৃহে যেতে পারছি না। এমন কি প্রিয় মানুষজনের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাতের কোনো উপায় নেই।

অর্থাৎ, আমাদের স্বাভাবিক যা চাওয়া, যে পেতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম— তা পেতে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই বাধার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ জন্মাতে পারে। সেই বিস্ফারিত ক্রোধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পরিবারের অন্য সদস্যরা। তবু সংশ্লিষ্ট মানুষটির পক্ষে তা মন্দের ভালো। অপরপক্ষে, এই অপ্রাপ্তি আমাদের অবসাদে ডুবিতে দিতে পারে, যা ক্ষোভ নয়, ক্রোধ নয়— শুধু নিরুচ্চার হতাশা।

অবসাদ শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে ‘‘অব’’ উপসর্গের সঙ্গে সদ্ ধাতুকে পাওয়া যায়। অব মানে ‘‘নীচে’’ আর সদ্ ধাতুর মানে— ত্যাগ, গতি অথবা দুঃখ (ষদ্‌লৃবিশরণ-গত্যবসাদনেষু - পাণিনীয় ধাতুপাঠ)। অর্থাৎ, অবসাদ হল যা আমাদের মনকে তার স্বাভাবিক অবস্থান ত্যাগ করিয়ে নীচের দিকে গমন করায় যার ফল দুঃখ পাওয়া।

এ প্রসঙ্গে আমরা রামায়ণে সীতার পাতালপ্রবেশের কথা মনে করতে পারি। সীতাকে রামচন্দ্র আবারও অগ্নিপরীক্ষার কথা বললে, সীতা বলেছিলেন—‘‘আমি যদি কায়মনোবাক্যে (রামচন্দ্র ভিন্ন) আর কারোর কথা না ভেবে থাকি, তবে হে বসুমতী, আমাকে আশ্রয় দাও (‘‘তন্মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি’’)। এই পাতালপ্রবেশ যেন এই অপমানের সংসারের থেকে সর্বতোভাবে মুখ ঘুরিয়ে সীতার এক চূড়ান্ত মানসিক অবসাদে ডুবে যাওয়া। এই অনুভূতি চরম অপমানের মুহূর্তে সংবেদনশীল মানুষমাত্রেরই হয়ে থাকে; যে-কারণে প্রবল লজ্জা বা অপমানের সময়টির বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা উদ্ধৃত করি সীতার বচন—‘‘মা ধরণী দ্বিধা হও’’।

আমাদের চূড়ান্ত অবসাদের সময়ে আমরা যেন মনের মধ্যে সুড়ঙ্গ করে এমনই গভীর গর্তে ঢুকে যাই। তাই হয়তো মানসিক অবসাদকে ইংরেজিতে ‘mental depression’ বলে। এ যেন জীবনানন্দের বলা ‘‘অদ্ভুত আঁধার এক পৃথিবীতে এসেছে আজ’’। এই অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে আমাদের মনের সব আলো, সব উজ্জ্বলতাকে ঢেকে ফেলছে। আমাদের মন এই অবসাদের সময়ে তার দৃষ্টিশক্তি হারায়। আর মন যদি আলো না দেখে, তবে আমরা জীবনের উজ্জ্বল দিক, ইচ্ছাপূর্তির উৎসব দেখবো কী করে?

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদের পর এবার অথর্ববেদের প্রসঙ্গ। এই বেদে রয়েছে সাধারণ মানুষের কথা। সেকালেও কিন্তু তাঁরা জানতেন, শরীরের মতোই মনেরও যে অসুখ হতে পারে সেই কথা। অথর্ববেদসংহিতার শৌনকশাখার অষ্টমকাণ্ডের প্রথমেই রয়েছে আয়ুষ্য সূক্ত। এই সূক্তে যে-মানুষটি মুমূর্ষু তার মনে যাতে আবার বাঁচার ইচ্ছা জেগে ওঠে, সেই জন্যে তাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে— ‘তুমি মারা যেও না। ফিরে এসো এই পৃথিবীতে’; এই ‘‘সূর্যস্য ভাগে’’, ‘‘অমৃতস্য লোকে’’— সূর্যের আলো যেখানে পৌঁছয়; সন্তান-সন্ততির মধ্যে দিয়ে তুমি যেখানে অমৃতত্ব লাভ করবে— সেখানে ফিরে এসো (‘‘ইহায়মস্তু পুরুষঃ সহ সুনা সূর্যস্য ভাগে অমৃতস্য লোকে’’ ৮/১/১)।

তোমার শরীর যেন এক রথ। সেই রথ থেকে তুমি নেমো না (“আ হি রোহমমৃতং সুখং রথমথ” ৮/১/৬)।

তোমার পূর্বপুরুষেরা যে মৃত্যুর পথে গেছেন, সে পথ তোমার অজানা। ভয়ঙ্কর সে পথে যেও না (“মৈনং পন্থামনু গা ভীম এষ যেন পূর্বং নেয়থ তং ব্রবীমি” ৮/১/১০)।

তুমি জীবিতদের দিকে ফেরো। যে (জীবিত)-আমরা তোমাকে ভালোবাসি, তাদের কথা ভেবে তুমি মৃত্যুর কথা ভুলে যাও (“মা তে মনস্তত্র গান্মা তিরো ভূন্মা জীবেভ্যঃ প্র মদো মানু গাঃ পিতৄন্” ৮/১/৭)।

আমরা মৃত্যুর দেবতাকে প্রণাম জানাই। তিনি যেন তোমাকে নির্ঋতির পাশ (= বন্ধন) থেকে মুক্ত করেন। (“উত্ ত্বা নৈর্ঋত্যাঃ পাশেভ্যো দৈব্যাং বাচা ভরামসি” ৮/১/৩)। ঐ পাশে তুমি আবদ্ধ থেকে না। তুমি উঠে এসো। (“উত্ ক্রামাতঃ পুরুষ মাব পত্থা মৃত্যোঃ পড্‌বীশমবমুঞ্চমানঃ” ৮/১/৪)।

মুমূর্ষুকে বার-বার উঠে আসার কথা বলা হচ্ছে। তলহীন অতলে তলিয়ে যাওয়ার থেকে উঠে আসার কথা বলা হচ্ছে। এই তলিয়ে যাওয়াই তো অবসাদ। এই উঠে আসাই জীবনের দিকে ফেরা। যতক্ষণ কোনও মুমূর্ষু নিজে থেকে বাঁচতে না চাইছে তাকে বাঁচানো সম্ভব নয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেও তা প্রমাণিত। আজকাল কোমায় চলে যাওয়া রোগীর কানেও সাইকোথেরাপির মাধ্যমে সুর, উদ্দীপক কথা পৌঁছে দেওয়া হয়, এর দ্বারা ওই প্রায়-মৃত মানুষটির মধ্যে বেঁচে থাকার ইচ্ছে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়— অনেকসময় তাতে কাজও হয়— রোগী কোমা থেকে ফিরে আসতে পারে।

একেবারে চরম পর্যায়ে আয়ুষ্যসূক্তের ঋষি বলছেন— “ফিরে এসো, তোমার জন্য শুদ্ধ বায়ু বইবে; সূর্য তোমাকে আরামদায়ক তাপ দেবে, অমৃতজল বর্ষণ করবে আকাশ। (পারছো না?) আমার হাতদুটো বাড়িয়ে দিচ্ছি। আঁকড়ে ধরছি তোমার হাত। (“আ তে হস্তৌ রভামহে” ৮/১/৮)। যখন সমস্ত বাণী ব্যর্থ হয়ে যায় তখন স্পর্শ কথা বলে— “শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,/মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।” সেই প্রাণের পরশই স্পর্শ। স্পর্শ দিয়ে মৃত্যু থেকে জীবনে, অবসাদের অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরিয়ে আনতে হয়।

ঋগ্বেদের ঋষি বিপ্রবন্ধু গৌপায়নের মন-আবর্তন সূক্তে (১০/৫৮) হতচেতন, হতসংজ্ঞ, অবসাদে তলিয়ে থাকে মানুষটিকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনার ডাক দেওয়া হয়েছে। অনেকে এই সূক্তটিকে পুনর্জন্ম সূক্তও বলেন। যেন সেই মানুষটি প্রায় মরে গিয়েছিল আবার তাকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এই সূক্তের প্রথম তিনটি মন্ত্র এখানে উদ্ধৃত করা হল—

যৎ তে যমং বৈবস্বতং
মনো জগাম দূরকম্।
তৎ ত আ বর্তয়ামসি
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে॥১॥

যৎ তে দিবং যৎ তে পৃথিবীং
মনো জগাম দূরকম্।
তৎ ত আ বর্তয়ামসি
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে॥২॥

যৎ তে ভূমিং চতুর্ভৃষ্টিং
মনো জগাম দূরকম্।
তৎ ত আ বর্তয়ামসি
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে॥৩॥

আমার আচার্য্য গৌরী ধর্মপাল এর অনুবাদ করেছেন। সেই অপূর্ব অনুবাদের অংশ-বিশেষ এইরকম—

তোমার যে-মন উধাও সুদূরে
বৈবস্বত যমে
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে॥১॥

তোমার যে-মন সুদূরে উধাও
দ্যুলোকে পৃথিবীলোকে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে॥২॥

সুদূরে উধাও তোমার যে-মন
ধরার চতুষ্কোণে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে॥৩॥

সুদূরে উধাও যে-মন তোমার
দিকে দিকে দিকে দিকে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে॥৪॥

যে-মন তোমার উধাও সুদূরে
সমুদ্রে-জলধিতে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে॥৫॥

যে-মন তোমার উধাও সুদূরে
আলোকের ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে।।৬।।

তোমার যে-মন উধাও সুদূরে
বৃক্ষলতায় জলে
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে।।৭।।

সুদূরে উধাও তোমার যে-মন
মহা-গিরি-পর্বতে
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে।।৮।।

[পুরোনোতুন বেদের কবিতা, পৃ ৪৫৩, ৪৫৫]

অবসাদের কারণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের চাওয়া এবং না-পাওয়ার বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে। এছাড়াও বলা দরকার যে, শরীর খারাপের সঙ্গে মনখারাপের এক গভীর যোগ রয়েছে। রোগভোগে মানুষের শরীর যদি বিকল হয়, তখন মনও অবসন্ন হয়ে পড়ে।

সামবেদের ছান্দোগ্যোপনিষদে (৬/৭) আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন 'অন্নময়ং মনঃ' (মন অন্ন দ্বারা গঠিত)। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরকম— ঋষি আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে প্রাণ, মন ইত্যাদির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাণকে জলময় আর মনকে অন্নময় বললেন। এই ব্যাখ্যার যাথার্থ্য বোঝানোর জন্য শ্বেতকেতুকে পনেরো দিন শুধু জলগ্রহণের বিধান দিলেন পিতা। উপবাসের নিয়মপালনের পর অনশনক্লিষ্ট পুত্রকে প্রশ্ন করতে থাকলেন অধীত শাস্ত্রগ্রন্থের বিষয়ে। শ্বেতকেতু কোন উত্তর দিতে পারলেন না। 'বুভুক্ষিতং মে চ ন প্রতিভাতি কিঞ্চিৎ'— আমি এতই ক্ষুধার্ত যে কিছুই মনে করতে পারছি না— স্বীকার করলেন শ্বেতকেতু। প্রমাণ হল অন্নের অভাবে প্রাণধারণ করা চলে কোনমতে কিন্তু মন বিকল হয়ে যায়। অতএব, মন অন্নময়ই বটে।

আমাদের মন খারাপের সময়ে তাই খাওয়া বন্ধ করলে কোনো উপকার নেই। আবার মন-খারাপের অজুহাতে অতিভোজনেরও বিপদ আছে— এটি ডিপ্রেশন বা অবসাদের বিশেষ লক্ষণ। তাই মনের অসুখ ঘটলে তারই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। সুখাদ্যের মাধ্যমে সাময়িক সুখভোগ কোনো সমাধান নয়।

এই সামবেদেই রয়েছে নারদ-সনৎকুমার সংবাদ। নারদ বলেছেন— বাকের থেকে মনই শ্রেষ্ঠ (৭/৩)। (শুক্লযজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণে প্রজাপতিও তাই বলেছিলেন, পূর্বে দ্রষ্টব্য)। নারদের মতে হাতের মুঠোয়

ধরে রাখা দু-টুকরো আমলকী বা হরতকীর মতোই মন, বাক্ এবং নামকে ধরে রাখে। মন ঠিক থাকলেই আমরা নাম ধরে চিনি, গলা ছেড়ে ডাকি।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ষোড়শ অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডে মানুষের আচ্ছন্ন অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। রোগশয্যার চারপাশ থেকে জ্ঞাতিরা বলে চলেছে— 'চিনতে পারছো আমায়?' রোগী ততক্ষণ কাউকে চিনতে পারে না, যতক্ষণ তার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে আর তেজ পরব্রহ্মে উপসংহৃত না হয়।

মন বস্তুত পরব্রহ্মে একীভূত হয়। ব্রহ্ম শব্দটি বৃ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। সর্ববৃহৎ যা সবকিছুকে ব্যাপ্ত করে তাই ব্রহ্ম। মনও ব্রহ্মই।

যা বৃহৎ তাকে কোনো গ্লানি, কোনো মালিন্য, কোনো অবসাদ গ্রাস করতে পারে না। তবে কি-না, আমাদের দিন-যাপনের গ্লানি তো আছেই। সেখানে মতান্তর থেকে মনান্তরও ঘটে। এই মন-কষাকষি থেকে মুক্তি পাওয়ার চমৎকার উপায় অথর্ববেদের সাংমনস্য সূক্তে (৩/৩০/১) ঋষি অথর্বা বলেছেন—

সহৃদয়ং সাংমনস্যম্
অবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যম্ অভি হর্ষত
বৎ সং জাতম্ ইবা.ঘ্ন্যা॥

আচার্য্য গৌরী ধর্মপাল এই সূক্তের অনুবাদে বলছেন—

বিদ্বেষহীন করি তোমাদের,
একমন এক হৃদয় প্রাণ।
একে অন্যকে চাও, ভালোবাসো,
গাভীর যেমন বাছুরে টান

[পুরোনোতুন বেদের কবিতা, পৃ ৪৪৩]

অথর্ববেদে মনকে পরমেষ্ঠী - যা পরমে প্রতিষ্ঠিত - তার সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। এই পরমেষ্ঠী মন এক বিশাল গাছের মতো— তার ডালপালা যেখানেই থাক্, তার শিকড়টি ছুঁড়ে আছে যা মহত্তম, যা সুন্দরতম, যা বাঞ্ছিততম তাকে।

প্রেমে ব্যর্থতাও মানুষের মনে অবসাদ আনে। ছান্দোগ্য-উপনিষদের রৈক্বজানশ্রুতি সংবাদ (৪/১-৩) অবলম্বনে রচিত প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক হজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর অনামদাস কা পোথা উপন্যাসে এমনই এক প্রণয়ার্ত রাজকুমারীর মনোবেদনা ঘোচানোর জন্য কোহলীয় নাট্যসম্প্রদায়ের বিধি অনুযায়ী গন্ধর্ব পূজার উল্লেখ করা হয়েছে। গন্ধর্বই হলেন কন্দর্প বা প্রেমের দেবতা। এই গন্ধর্ব-পূজা আসলে একটি প্রেম-বিষয়ক নাট্যাভিনয় যা ওই অবসাদগ্রস্ত মেয়েটির মন ভালো করে দিতে পারে। নাট্যাভিনয়কে একপ্রকারের বিনোদন বলা হয়। বিনোদন মানেই যা মনের ক্লান্তি ও অবসাদকে বিশেষভাবে নোদন (দ্র. ণুদ প্রেরণে— পাণিনীয় ধাতুপাঠ)

অর্থাৎ দূরে পাঠিয়ে দেয়। তাই মানসিক অবসাদ দূরীকরণে বিনোদনের ভূমিকা ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রেই স্বীকৃত।

উপসংহারে আমরা অথর্ববেদের শৌনক সংহিতার ঊনবিংশ কাণ্ডের নবম সূক্তটির কথা বলতে পারি। ঋষি ব্রহ্মার এই শান্তিসূক্তের চতুর্থ এবং পঞ্চম মন্ত্রটি এইরকম—

ইদং যৎ পরমেষ্ঠিনং
মনো বাং ব্রহ্মশংসিতম্।
যেনৈব শান্তির্ অস্তু নঃ॥

ইমানি যানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি
মনঃষষ্ঠানি মে হৃদি ব্রহ্মণা সংশিতানি।
যৈর্ এব সসৃজে ঘোরং
তৈর্ এব শান্তির্ অস্তু নঃ॥

আচার্য্য গৌরী ধর্মপালের অনুবাদে—

সবার ওপরে রয়েছে এই যে
তোমাদের মন শাণিত মন্ত্রে
যাকে দিয়ে করা হল অভিচার
তা দিয়েই হোক মোদের শান্তি

এই যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-মন
হৃদয় আমার শাণিত মন্ত্রে
করেছি যাদের দিয়ে অভিচার
তাদের দিয়েই হোক না শান্তি।

[পুরোনোতুন বেদের কবিতা, পৃ ৪৬১]

পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অ-সুখ এখন। সকলের শান্তি হোক।

প্রবন্ধটি, ৮/৮/২০২০ বাসন্তীদেবী কলেজ এবং জগবন্ধু কলেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রদত্ত বক্তৃতার লিখিত রূপ॥ অনুলিখন ঃ ড: অনন্যা মিত্র, সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, বাসন্তীদেবী কলেজ॥